জামশেদজি থেকে রতন

কেন রাজ্যে রাজ্যে টাটাদের বিরুদ্ধে মানুষের গণ প্রতিরোধ

একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে টাটাদের সম্পর্কে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয়েছে উপকথা বা মিথ। যেমন, টাটারা মহান দেশপ্রেমিক শিল্পপতি। তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে আর কোনো শিল্পগোষ্ঠীর তুলনা হয় না। যেমন, টাটা কারখানায় ধর্মঘট হয় না, শ্রমিক শোষণ হয় না। তাদের কর্মী হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। টাটা কারখানায় ধর্মঘট হয় না একথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। সেইসব মিথ্যা ইতিহাস, অলীক গৌরব গাথার ধোঁয়া ভেদ করে নানা রাজ্যে টাটাদের যে ইতিহাস বা বর্তমান কার্যকলাপ জনগণের সামনে বেরিয়ে আসছে তা রক্তাক্ত, বর্বর এবং বীভৎস। আসুন তথ্য ও যুক্তির আলোকে এইসব তথ্য ও সত্যগুলি একটু খুঁজে দেখি।

SEZ বিরোধী প্রচার মঞ্চ

টাটা গোষ্ঠী ভারতের অন্যতম প্রধান এবং অতিবৃহৎ একটি শিল্প সংস্থা। তাদের সম্বন্ধে ভারতের জনসাধারণের, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বিশেষ উচ্চ ধারণা বর্তমান। এই উচ্চ ধারণার পিছনে রয়েছে বহুদিন ধরে গড়ে তোলা উপকথা। সরকার, বাজারি সংবাদ মাধ্যম এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর দ্বারা এইসব গল্পগাথা জন মানসে প্রচার করা হয়েছে। টাটাদের দেশপ্রেম, তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, দেশের উন্নতিতে তাদের অবদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রভূত বিনিয়োগ এ সবই আজ কিংবদন্তির আকার ধারণ করেছে। এই খ্যাতিকে মূলধন করে টাটারা শুধুই যে তাদের মুনাফা বাড়িয়েছে তা নয়, 'স্বাধীন' ভারতের বহু নীতি নির্ধারণেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত নীতিই ভারতের এবং বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছে। ভারতের শাসকশ্রেণীর উপর টাটার প্রভাব এতই সুদূর প্রসারি ছিল যে, আজ যারা টাটাদের সাদরে পশ্চিমবঙ্গে আহ্বান জানিয়েছে, সেই সি. পি. আই (এম)-ই একদা ভারতের শাসক দলের প্রতি 'টাটার দালাল' বিশেষণটি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করত। টাটার এই বিরাট খ্যাতির কারণে টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্ণধাররা ভারত সরকারের বিভিন্ন পুরস্কারের দ্বারা বারবার বিভূষিত হয়েছে, এমনকি ভারত সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভারতরত্নও টাটা গোষ্ঠীর এক পূর্বতন কর্ণধার জে. আর. ডি. টাটাকে প্রদান করা হয়েছে। এই খ্যাতির কারণেই আজ টাটার সিঙ্গুর থেকে সম্ভাব্য প্রস্থান নিয়ে এ রকম 'গেল গেল' রব উঠেছে, যেন টাটার সিঙ্গুর কারখানার অনুপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে টাটার এই খ্যাতির কারণ, তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বরূপ এবং দেশের জনগণের উন্নতিতে তাদের অবদান যাচাই করে দেখা উচিত। সংবাদ মাধ্যম বা টাটার গুণগ্রাহী বুদ্ধিজীবীরা যাই বলুন না কেন, টাটার সাম্প্রতিক এবং পূর্ববর্তী ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।

নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক উদারিকরণের পূর্বে টাটারা ছিল লাইসেন্স-পারমিট রাজের অবিসংবাদিত রাজা। ভারতের শাসক দলগুলি ও সরকারের সাথে তাদের নৈকট্য তাদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেয় যার দ্বারা তারা পুঁজির পাহাড় সৃষ্টি করে। এর মধ্যে অনেকবার সরকার নিজের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেইল) বা ইসকোর ব্যবসায়িক স্বার্থের উপর টাটার স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। এই সময়ে টাটারা তাদের বিভিন্ন মানবাধিকার, শ্রম আইন এবং পরিবেশ আইন লঙ্ঘনকে চাপা দেয় সরকারি আনুকুল্যে এবং কিছু 'সমাজসেবামূলক' বিনিয়োগের দ্বারা। মনমোহনের জমানায় আর্থিক উদারিকরণের পর টাটারা তাদের এই পুঁজি লগ্নী করা আরম্ভ করে একদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, অন্যদিকে বিশ্বায়নের যুগের বিশ্বব্যাপী বাজারি অর্থনীতির মধ্যেও তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা আরম্ভ

করে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থাকে কিনে নেওয়ার দ্বারা। এই সময়ই তাদের 'সামাজিক দায়বদ্ধতার' আড়াল অনেকটা সরে গিয়ে তাদের মুনাফা লোভী রূপটা প্রকট হয়ে পড়ে, যার প্রমাণ আমরা পাই বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ও বিদেশনীতিতে টাটার হস্তক্ষেপ .

ভারতের অর্থনীতি নির্ধারণে টাটার ভূমিকা বহুদিন ধরেই বর্তমান। এর সূচনা হয় জানুয়ারি ১৯৪৪-এর Bombay Plan-এর মধ্যে দিয়ে। এই Plan রচনায় জে. আর ডি টাটা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সঙ্গে ছিলেন বিড়লা, লালা শ্রীরাম, কস্তুর ভাই, লাল ভাই প্রমুখ ভারতের তৎকালীন সর্ববৃহৎ শিল্পপতিরা। এই Plan অনুযায়ীই স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পনীতি নির্ধারিত হয়। এই শিল্পপতিরা ঠিক করেন যে, যেইসব ক্ষেত্রে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন, কিন্তু যাতে মুনাফা কম হয়, সেইসব ক্ষেত্র রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হিসাবে গড়ে উঠবে কিন্তু যেইসব ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের কম প্রয়োজন কিন্তু লাভের সম্ভাবনা বেশি, সেইসব ক্ষেত্র ব্যক্তি মালিকানার অধীনে থাকবে। এর দ্বারা তারা ভবিষ্যতে তাদের লাভের রাস্তা প্রশস্ত করে এবং একই সাথে ভারতের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দায়ভার নিজেদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে। এইভাবে চল্লিশ বছর চলার পর ৯০-এর দশকে যখন টাটা প্রমুখ শিল্পপতিরা তাদের মুনাফা এবং জমানো পুঁজির বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে তখন তারা এই ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে উদারীকরণ এবং বে-সরকারিকরণের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। এবং তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা করে দেয় একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকার। তা কংগ্রেস কি বাম-সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট কি বিজেপির এন. ডি. এ — যাই হোক না কেন।

২০০৫ সালে কেন্দ্রে পুঁজিপ্রেমী মনমোহন সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ পুঁজিপতি দ্বারা চালিত বুশ সরকারের মধ্যে হৃদ্যতার কারণে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী মিলে সৃষ্টি করে US-India CEO Forum। এই সংস্থাটি ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশেষ প্রভাবশালী পুঁজিপতিদের মিলিত উদ্যোগ যার সভাপতি হন রতন টাটা। এই সংস্থাটির লক্ষ্য ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এই আপাত নিরীহ লক্ষ্যের আড়াল থেকে এরা অনেকগুলি প্রস্তাব দেয় যার প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষের অনেকগুলি আইন পাল্টানো এবং অনেক নতুন আইন প্রণয়ন করা যার দ্বারা ভারতে লগ্নীকারীদের জন্যে অনেক সুবিধা বাড়ানো যায়। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন শিথিল করা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা, প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষার ওপর

জোর দেওয়া, এবং লগ্নীকারিদের বিভিন্ন দায়ভার (যথা ভূপাল জাতীয় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে) কমিয়ে দেওয়া। ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমানবিক চুক্তির পেছনে এই সংস্থাটি ছিল প্রধান উৎসাহদাতা। এই সংস্থাটি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার বাইরে এবং উর্দ্ধে কাজ করে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে এই সংস্থাটির একটি প্রস্তাবও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আইনে পরিবর্তন করার কথা বলেনি। এই সংস্থাটির কাজকর্ম থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা ২০০৫ সাল থেকে একটি সংবিধান বহির্ভূত সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন যার একমাত্র লক্ষ্য হল ভারতের সাধারণ মানুষের, বিশেষত শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশে বিদেশী পুঁজির মুনাফা বাড়ানোর পথ প্রশস্ত করা এবং ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী গণ্ডীর মধ্যে পুরোপুরিভাবে নিয়ে ফেলা। টাটার দেশপ্রেমের এ এক দারুন নিদর্শন!

ভূপালের খুনী ইউনিয়ন কার্বাইডকে সহায়তা

টাটার বিদেশী পুঁজি প্রেমের আর এক জ্বলন্ত উদাহরণ হল কুখ্যাত ইউনিয়ন কার্বাইডের উত্তরসুরী ডাও কেমিক্যালসকে সহায়তা করার চেষ্টা। ১৯৮৪ সালের ভূপালের সেই মারাত্মক দুর্ঘটনাকে আমরা কখনই ভুলবো না যাতে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসে ২০,০০০ লোক মারা যান এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষ চিরকালের মত বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ হয়ে যান। সেই সময় ইউনিয়ন কার্বাইডের Chairman ওয়ারেন এ্যাণ্ডারসনের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে জে. আর. ডি টাটা। এ্যাণ্ডারসন জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান এবং তারপর থেকে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার পরও কোনদিন তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে ফেরত আনা যায়নি। এদিকে ভূপালের গ্যাসপীড়িত মানুষেরা চরম দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এরপর ইউনিয়ন কার্বাইডকে কিনে নেয় আরেকটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা ডাও কেমিক্যালস। এই সংস্থাটি প্রতিবাদ ও জনপ্রতিরোধের ভয়ে এখনো ভারতবর্ষে বড় ভাবে কোন বিনিয়োগ করেনি। অন্যদিকে ভারতের বিচার ব্যবস্থা ডাওকে বলেছে যে ভূপালের গ্যাস প্রভাবিত অঞ্চলকে বিষমুক্ত করার জন্য ১০০ কোটি টাকা জরিমানা দিতে, যা দিতে ডাও কেমিক্যালস সম্মত নয়। এই সময়ে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে রতন টাটা প্রস্তাব দেন যে টাটা গোষ্ঠী একটা কনসর্টিয়াম গড়ে ভূপাল থেকে গ্যাস জনিত বিষাক্ত পদার্থ পরিষ্কার করে দেবে। এর দ্বারা ডাও কেমিক্যালস-এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং ভারতে ডাওয়ের ব্যবসা করার রাস্তা প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হয়। এই ডাও এমনই একটি ঘৃণিত সংস্থা যে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রেও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ছাত্রদের চাকরিতে নিয়োগ করতে গেলে ছাত্ররা প্রতিবাদ করে। ভারতে নন্দীগ্রামে সালিমের কুখ্যাত কেমিক্যাল হাব এবং মহারাষ্ট্রের রত্নগীরিতে ডাও কারখানা খোলার চেষ্টা করে জনপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। এহেন ডাও কেমিক্যালসের দালালি করে রতন টাটা কি সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রাখছেন তা একমাত্র তাঁর গুণমুগ্ধ সংবাদমাধ্যমগুলিই বলতে পারে।

আদিবাসী জমি দখল ও নিপীড়ন

টাটার বহু অনুগামী ভক্ত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সিপিএম, বারবার বলছে যে টাটার কারখানা নাকি সিঙ্গুরের অর্থনীতিকেই বদলে দেবে এবং সিঙ্গুরের মানুষের জীবনযাত্রার প্রভূত উন্নতি ঘটাবে। এই বিষয়ে টাটার জামশেদপুর কারখানার ইতিহাস তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯০৭ সালে জামশেদপুরে টিসকো কারখানা স্থাপনের সময় টাটারা ৪৬,৩৩২ টাকা দিয়ে ৩৫৬৪ একর জমি অধিগ্রহণ করে যা ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত। নোয়ামুণ্ডি অঞ্চলের এইসব আদিবাসী গ্রাম বিলোপ করা হয় এবং তাদের অধিবাসীদের উৎখাত করা হয়। এই সব আদিবাসীরা কোনদিন টাটা কারখানায় চাকরি পাননি, তার বদলে জমিহারা হয়ে এরা দারিদ্র্য ও নেশার মধ্যে ডুবে গেছেন। অন্যদিকে নোয়ামুণ্ডি অঞ্চলের আদিবাসীরা যখন টাটার লৌহখনিতে কাজ করতে অসম্মত হয় তখন টাটা কর্তৃপক্ষ সে অঞ্চলের সকল কুসুমগজ গাছ কেটে ফেলে। এই গাছগুলি আদিবাসীদের জীবিকার একটি প্রধান উপকরণ ছিল কারণ তাঁরা এই গাছে বসবাসকারী লাক্ষাকীট থেকে লাক্ষা সংগ্রহ করতেন। এই গাছগুলি কেটে ফেলে তাদের খনিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ২০০০ সালে টাটারা তাদের খনির পার্শ্ববর্তী আগারিয়া টোলা বলে একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে একটি ঝরনাকে ধ্বংস করে দেয় যেটি ছিল সেখানকার মানুষের জলের প্রধান উৎস এবং তাদের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ২০০৫ সালে ছত্তিশগড় রাজ্যের জগদলপুর জেলার লোহাণ্ডিগুডায় একটি ইস্পাত প্রকল্প স্থাপনের জন্য টাটারা ছত্তিশগড় সরকারের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলের আদিবাসীর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ঐ বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে বাধ্য হন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক লাচ্ছু রাম কশ্যপ। যদিও পরবর্তীকালে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কশ্যপকে এই আন্দোলন থেকে বিরত করে। ১২টি গ্রামের গ্রাম সভা এই জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে এবং বিক্ষোভ থামাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে। ছত্তিশগড়ে টাটার সহায়তা করছে কুখ্যাত 'সালোয়া জুড়ুম' যা সমগ্র আদিবাসী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে এক ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গতঃ এই ইস্পাত প্রকল্প তৈরির জন্য টাটাদের সঙ্গে ছত্তিশগড় সরকারের

কি চুক্তি হয়েছে সিঙ্গুরের মতই তা 'গভীর গোপন' থেকে গেছে। সেখানকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বা সমাজকর্মীরা হাজার চেষ্টা করেও সেই চুক্তি জানতে পারেননি। একইরকমভবে জামশেদপুরের কাছে গুয়াতে, ওড়িশার গোপালপুর ও কলিঙ্গনগরে এবং কাশীপুরে টাটারা আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়। এই পুস্তিকায় পরবর্তী অংশে এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ

টাটাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি প্রধান নিদর্শন নাকি তাদের পরিবেশের প্রতি যত্ন। সিঙ্গুর কারখানাতেও নাকি অনেকটা জমি ঠিক করা আছে বনসৃজনের জন্যে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা জানতে পারি যে রতন টাটার নেতৃত্বে একদল শিল্পপতি কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন করেছিলেন যে গাড়ী শিল্পকে Environmental Impact Assesment (EIA) থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক, তাহলে কিন্তু এই পরিবেশ প্রেমী রূপটা অনেকটাই নগ্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভারত সরকারের যে আইন অনুযায়ী প্রতিটি শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশের উপর তার প্রভাব কি পড়বে তা খতিয়ে দেখার যে নিয়ম তা থেকে টাটারা অব্যাহতি চায়। যদিও গাড়ি শিল্প যে পরিবেশ কম দূষণ করে তার কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। এবং বলাই বাহুল্য ভারত সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেয়। এর মানে হচ্ছে যে সিঙ্গুরে টাটা মোটরস কারখানার কোন EIA হয়নি এবং চারপাশের কৃষিজমি ও মানুষের জীবনে তার কি পরিবেশগত প্রভাব পড়বে তা নিয়ে চিন্তাই করা হয়নি।

পরিবেশ সম্পর্কে টাটার এই মনোভাব কিন্তু নতুন কিছু নয়। টাটার শিল্পগুলির রয়েছে পরিবেশ দূষণের এক লম্বা ইতিহাস। ওড়িশার সুখিন্দা অঞ্চলে রয়েছে টাটার বিরাট ক্রোমাইট খনি। ভারত সরকারের Comptroller and Auditor General সুখিন্দাকে প্রচণ্ডভাবে দূষিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছে। সুখিন্দার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া ডোমশালা নদী এবং আরো ত্রিশটি ছোট-বড় নদী ক্রোমিয়াম দ্বারা দুষিত। এই ক্রোমিয়াম টাটাদের খনি এবং বর্জ্য পদার্থ রাখার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে পরিবেশকে দূষিত করছে। ওড়িশা পরিবেশ প্রকল্পের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে খনিগুলির এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ এই ক্রোমিয়াম দূষণের দ্বারা আক্রান্ত যাতে শ্বাসনালীর বিভিন্ন অসুখ, নাসিকার আলসার এবং নিউমোনিয়া জাতীয় বিভিন্ন অসুখ হয়।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গুজরাটের মিঠাপুরে টাটা কেমিক্যালস-এর সোডা অ্যাশ কারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ কচ্ছ উপসাগরের সামুদ্রিক জাতীয় উদ্যানে ছড়িয়ে

পড়ে। ১৫০ একরের উপর বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়া এই বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ওই অঞ্চলের পরিবেশকে ভীষণভাবে দূষিত করে। গোয়ার National Institute of Oceanography-র মতে কচ্ছ উপসাগরের উপকূল বরাবর প্রায় ১০ কিমি অঞ্চল এই কারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, মিঠাপুর অঞ্চলে বহু কৃষক তাঁদের কৃষিজমি হারিয়েছেন কারণ টাটাদের লবণ তৈরীর কারখানা থেকে লবণাক্ত জল তাদের জমিকে চাষের অযোগ্য করে তুলেছে।

একইভাবে হায়দ্রাবাদের কাছে পাতানচেরুতে টাটাদের আরেকটি সংস্থা রজলিস ইণ্ডিয়া লিঃ পরিবেশ দূষণের দায়ে সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছে। তাদের কীটনাশক প্রস্তুত কারখানা এই অঞ্চলের দূষণের জন্যে প্রধান অভিযুক্ত। জামশেদপুরের টাটা স্টিল কারখানা থেকে উদ্ভূত বয়লার অ্যাশ জামশেদপুরের নিকটে যুগসলাই গ্রামে ফেলা হয় এবং তা থেকে ওই অঞ্চলের পরিবেশ এবং ভূমিগত জল দূষিত হয়ে পড়েছে। একইভাবে জোডা মাইনস্ অঞ্চলে, যেখানে টাটা, বিড়লা ও জিন্দালদের লৌহ খনি রয়েছে, সেখানকার মানুষজন ভীষণ দূষণের মধ্যে বাস করেন। যদিও এই অঞ্চল টাটা এবং অন্য শিল্পপতিদের ধনের উৎস, এই অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী সিধামাথা অভয়ারণ্য এই দূষণের জন্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বোকারোতে অবস্থিত টাটার কয়লা খনি থেকেও একই ভাবে বর্জ্য পদার্থ বোকারো নদীতে ফেলে নদীটিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। মুনাফার জন্য পরিবেশ দূষণের এই দীর্ঘ ইতিহাস টাটাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কি পরিচয় বহন করে তা তাঁদের তাঁবেদারদের জানানো উচিত। সিঙ্গুরে টাটা কারখানা হলে যে তা থেকে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এমনকি ওই অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া দামোদর উপত্যকা নিগমের সেচের খালগুলি দূষিত হবে না তা কে বলতে পারে?

টাটার অতীত ইতিহাস

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তোষণ ও শ্রমিক শোষণ : টাটা গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস, বিশেষত প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী টাটা সম্বন্ধে জনমানসে এক অত্যন্ত উজ্জ্বল চিত্র বর্তমান। আমাদের সকলেরই ধারণা যে জামশেদজী অপেক্ষাকৃত সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ের জোরে ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পের স্থাপনা করেন এবং ভারতবর্ষে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি ব্রিটিশ শিল্পের একচেটিয়া আধিপত্যকে খর্ব করতে সক্ষম হয় এবং এইভাবে তিনি এক মহান দেশপ্রেমিক কর্তব্য পালন করেন। কিন্তু টাটার অতীত ইতিহাস এবং টাটার শিল্পস্থাপনার ইতিবৃত্ত দেখলে আমরা একটি সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখি। আমরা দেখি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তোষণের

এক কলঙ্কময় ইতিহাস এবং ব্রিটিশদেরই বদান্যতায় সৃষ্ট একটি শিল্প সাম্রাজ্যের কাহিনী।

চীনে আফিম রপ্তানি

জামশেদজী টাটার ধনের আদি উৎস ছিল চীনে আফিম রপ্তানির ঘৃণ্য ব্যবসা। আঠারো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পর, যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতকে ধীরে ধীরে পদানত করছে, তখন তাদের ধন সংগ্রহের এক প্রধান মাধ্যম ছিল চীনে আমদানি রপ্তানির বাণিজ্য। চীন থেকে আমদানি করা চা, রেশম, সূতীবস্ত্র, মহার্ঘ চীনা পোর্সেলিন জাতীয় বহু পণ্য দ্রব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপে যোগান দিয়ে বিরাট অঙ্কের লাভ করত। বিনিময়ে চীনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানি ছিল খুবই কম। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে চীন থেকে প্রায় সমস্ত আমদানী করতে হত নগদ রূপোর বিনিময়ে। অন্যদিকে এই রূপোর প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবিস্তার করতে। তাই ইংরেজরা এমন একটি পণ্য চীনে রপ্তানি করা শুরু করে যা দিয়ে চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের দামও দেওয়া যাবে, এবং মহার্ঘ রূপোও খরচা হবে না। সেই পণ্যটি ছিল আফিম, যা ভারতবর্ষের উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চাষ হত। ইংরেজরা এই চাষকে বিপুলভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন আফিম চীনে রপ্তানি করা শুরু হয়। প্রথমে সস্তায়, এমন কি বিনা পয়সায় আফিম বিতরণ করে সমগ্র চীনা জাতিকে নেশাচ্ছন্ন করা হয়। তারপর আফিম রপ্তানি এমন হারে বাড়তে থাকে যে ২০ বছরের মধ্যে চীনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ঘাটতি মিটে গিয়ে রপ্তানি আমদানিকে ছাড়িয়ে যায়। চীনের সম্রাট যখন এই ব্যবসাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন তখন ইংরেজরা এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘোষণা করে যা কুখ্যাত 'আফিম যুদ্ধ' বলে খ্যাত। সম্পূর্ণ চীনকে আফিমের নেশায় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

এই কলঙ্কজনক ব্যবসায়ে যে সব ভারতীয় ব্যবসায়ী ইংরেজদের সহযোগী ছিল তাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জামশেদজি টাটা। তিনি ছিলেন আফিমের এক বৃহৎ গোলাদার ও সরবরাহকারি। পরবর্তীকালে টাটার বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্যের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল ইংরেজদের ঘৃণ্য আফিম ব্যবসার গোমস্তা হিসাবে। টাটার আপেক্ষিক সাধারণ অবস্থা থেকে উত্তরণের পিছনে রয়েছে এই আফিমের ব্যবসাই। এমনকি এই ব্যবসা যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে তার জন্যে জামশেদজী আফিম যুদ্ধের সময় ইংরেজদের জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহায়তা

জামশেদজীর ধনের আরেকটি উৎস ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সহায়তা করা। ১৮৬৫ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে ইংল্যাণ্ডের কাপড় কলগুলিতে আবার তুলো রপ্তানি শুরু হয়। এতে ভারতীয় তুলো রপ্তানিকারিদের প্রভূত ক্ষতি হতে থাকে। কিন্তু টাটা এই সময়েই (১৮৬৮ সালে) একটি অত্যন্ত লাভজনক বরাত লাভ করেন — ব্রিটিশ সেন্যবাহিনীর ইথিওপিয়া আক্রমণের জন্যে খাদ্য ও বস্ত্র যোগান দেওয়া। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ইথিওপিয়ায় অমানবিক অত্যাচার চালায় এবং টাটা তা থেকে মুনাফা করেন। পরবর্তীকালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও টাটা ইংরেজদের পূর্ব আফ্রিকা, মিশর প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া অভিযানের জন্য ইস্পাতের রেল ও বোমার খোল সরবরাহ করেন, যার জন্য ব্রিটিশ বড়লাট চেমস্ফোর্ড তাঁকে ধন্যবাদ জানান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি নিজের আনুগত্য জানাতে ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি জামশেদজী তাঁর নতুন কাপড় কারখানার নামকরণ করেন 'এমপ্রেস মিলস্' — সেই বছর রানী ভিক্টোরিয়ার ভারতের সম্রাজ্ঞী হওয়াকে সম্মান জানাতে।

টাটার প্রতি ইংরেজদের বদান্যতা

জনমানসে এই ধারণা বহুল প্রচারিত যে জামশেদজী টাটা ইংরেজদের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জামশেদপুরে ইস্পাত কারখানা (টাটা আয়রন ও স্টিল কোম্পানি-টিসকো) গঠন করেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক পত্র-পত্রিকার লেখক, এমনকি অনেক জাতীয়তাবাদী গবেষকও, টাটাকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শিল্পপতি হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু টিসকোর জন্মবৃত্তান্ত দেখলে বোঝা যায় সংস্থাটি ইংরেজদের আনুকূল্যে এবং সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে ইস্পাতের যে চাহিদা ছিল, ব্রিটিশ ইস্পাত শিল্প তা যোগান দিয়ে উঠতে পারছিল না। তাই প্রচুর পরিমাণে ইস্পাত এবং ইস্পাত নির্মিত যন্ত্রাংশ জার্মানি, বেলজিয়ম ও আমেরিকা থেকে আমদানী করতে হচ্ছিল, যাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ব্রিটিশ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ভারতে ইস্পাত শিল্প গড়ে তুলতে যাতে সস্তায় ইস্পাত পাওয়া যায়। এই কাজে যখন জামশেদজী এগিয়ে আসেন তখন ব্রিটিশরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং লর্ড কার্জন নিজে তাঁকে সমস্ত রকম সহায়তা করবেন বলে জানান। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের জিওলজিকাল সার্ভে আকরিক লোহার খনি চিহ্নিত করার ব্যাপারে সমস্ত রকম সহায়তা করে। তারপর বিহারের সাকচীতে বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে আদিবাসীদের

উৎখাত করে টাটার হাতে তুলে দেওয়া হয়, যেখানে ইস্পাত কারখানা ও জামশেদপুর শহর স্থাপিত হয়। এবং কারখানা তৈরি হওয়ার আগেই ভারতীয় রেলবোর্ড রেল লাইন ও অন্যান্য ইস্পাতের জিনিসের বরাত দেয়।

টিসকো স্থাপিত হওয়ায় সময় থেকে সব সময়ই সংস্থাটি ব্রিটিশদের বদান্যতা লাভ করে। ১৯০৭ সালে টিসকো স্থাপনের সময় ইউরোপে আর্থিক মন্দার কারণে টাটারা যদিও কোন ব্রিটিশ পুঁজি পাননি, কিন্তু লর্ড কার্জনের নির্দেশে ব্রিটিশদের মিত্র গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের একটা বড় অংশ (চার লক্ষ পাউণ্ড) দেন। এছাড়া আরও ১৪ জন দেশীয় রাজা টিসকোর শেয়ারের প্রধান অংশ কেনেন। এরপরে ১৯২২ সালে আর্থিক সঙ্কটের সময় ব্রিটিশ সরকারই টাটাদের রক্ষা করেন। ভাইসরয় লর্ড রিডিং ৫০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও লন্ডনের অর্থ-বাজারে ডিবেঞ্চার বেচে ওঠে ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ব্রিটিশ পুঁজির প্রতিভূ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দেয় ২ কোটি টাকা। আমেরিকার পুঁজিপতিরা লগ্নি করেন ৩০ লক্ষ টাকা এবং ভারতীয় মহারাজারা লগ্নি করেন ১ কোটি টাকা। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে সামন্ততন্ত্র, এই দুইয়েরই হাত ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলে 'জাতীয়তাবাদী' শিল্প সংস্থা টিসকো। একইভাবে ১৯১৫ সালে বোম্বের কাছে টাটার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের রূপায়ন হয় ব্রিটিশ সরকারের দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে যে কারণে বোম্বাইয়ের লাটসাহেব প্রকল্পটিকে 'imperial enterprise' বলে বর্ণনা করেন।

টিসকোতে শ্রমিক নিপীড়ন

এই কথাটিও আমরা বারবার শুনে আসছি যে টাটাদের কাছে তাদের শ্রমিকদের স্বার্থ একটা বড় ব্যাপার এবং টাটা অত্যন্ত শ্রমিক দরদী শিল্পপতি। এই জন্য নাকি টাটাদের কারখানায় কখনো শ্রমিক ধর্মঘট হয় না। কিন্তু টিসকোর ইতিহাসে রয়েছে শ্রমিকদের উপর লাগাতার নিপীড়নের ঘটনা এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মরিয়া লড়াই। টিসকোর জন্মলগ্ন থেকেই সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। বেশির ভাগ আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার ও বাঙালি কেরানীরা অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করতেন। ১৯২৪ সাল অবধি একদল শ্রমিককে সপ্তাহে সাতদিনই দিনে ৮ ঘণ্টা এবং অন্য এক দলকে দিনে ৯ ঘণ্টা কাজ করতে হত। বাধ্যতামূলক ৪ ঘণ্টা ওভারটাইম ছিল। মাসে কোন ছুটি ছিল না। বিভিন্ন অসুখে এবং কারখানার মধ্যে দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিক মারা যেতেন। মাত্র ৩৩ শতাংশ কর্মীকে থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। বাকিরা থাকত অস্থায়ী তাঁবুতে যেখানে একটি ১০ ফুট × ৬ ফুট সাইজের ঘরে একসাথে ৮-১০ জন মানুষকে থাকতে বাধ্য করা হত। ট্রেড ইউনিয়ন বানানোর অধিকার বা

শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা কোম্পানির স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এর পাশাপাশি ছিল কোম্পানির বেতনভুক গুণ্ডা দ্বারা শ্রমিকদের পেটানো ও মহিলা শ্রমিকদের লাঞ্ছনা করা।

তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে ১৯২০ সাল থেকে একের পর এক ধর্মঘট আরম্ভ হয়, কোন সংগঠিত ও স্বীকৃত ইউনিয়ন না থাকা স্বত্তেও। ১৯২০ সালের ধর্মঘটে কারখানার সামনেই সাহেব ম্যানেজাররা গুলি চালিয়ে পাঁচজন শ্রমিককে হত্যা করে। এরপর থেকে টিসকোতে শ্রমিক সংগঠন শুরু হয়। ১৯২২ সালে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে আবার ধর্মঘট হয়। এই সময় টাটা কর্তৃপক্ষ কখনও জল সরবরাহ বন্ধ করে, কখনো এলাকায় চাল-গম বিক্রি বন্ধ করে, কখনও হামলা করে বারবার ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করেছে। এর সাথে গান্ধী, মোতিলাল নেহরুর মত বিভিন্ন নেতারা এসে মধ্যস্থতার নমে শ্রমিকদের টাটার কথা মেনে নিতে বলেছেন। কংগ্রেসের নেতারা কখনও শ্রমিক স্বার্থে জ্বালাময়ী বিবৃতি দিতেন। আবার কখনও শ্রমিকদের পরামর্শ দিতেন স্বরাজের স্বার্থে 'ত্যাগ স্বীকার' করতে। ধর্মঘট অবসানের পর ১৯২৩-২৮ এর মধ্যে দু হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। এর মধ্যে ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে আরো দুবার ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে টিসকোর শ্রমিক সংগঠন জামশেদপুর লেবার এ্যাসোসিয়েশন (JLA) এর নেতৃত্বে আপোষকামী কংগ্রেস নেতৃত্বের জায়গায় উঠে আসেন মানেক হোমি নামে এক তরুণ পার্সি আইনজীবী। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে টাটা কর্তৃপক্ষ প্রায় চার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে ও হোমিকে জেলে পাঠানো হয়। ১৯৩২ সালে JLA-র নেতৃবৃন্দ — হরিমণি মিত্র, ননীগোপাল মুখার্জি প্রমুখকে বরখাস্ত করা হয় ও অপর নেতা মণি ঘোষকে বদলি করা হয়। ১৯৩৬ সালে আব্দুল বারি-র নেতৃত্বে শ্রমিকরা নতুন করে টাটা ওয়াকার্স ইউনিয়নে (TWU) সংগঠিত হন। ১৯৪০ সাল অবধি TWU-এর নেতৃত্বে টাটা শ্রমিকরা বিভিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যান।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-৪৯ সালে টিসকোতে গড়ে ওঠে সোসালিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন, যার নাম হয় 'কেন্দ্রীয় মজদুর কমিটি'। ততদিনে TWU শাসক দল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন INTUC-তে যোগদান করেছে এবং সরকারের নির্দেশে টিসকো কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই অবস্থায় ১৯৪৯ সালে আবার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। ধর্মঘটকে বিহার সরকার বেআইনি ঘোষণা করে এবং তীব্র দমন নীতি চালিয়ে ধর্মঘট ভেঙে দেয়। সরকারি সন্ত্রাসের মুখে সোসালিস্ট শ্রমিক ইউনিয়ন প্রায় ভেঙে যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালে এই ইউনিয়নের ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে ওঠে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত সি.পি.আই) নেতৃত্বাধীন জামশেদপুর মজদুর ইউনিয়ন (JMU)। বিখ্যাত সিপিআই নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এই ইউনিয়ন সংগঠনের কাজে এক প্রধান

ভূমিকা পালন করেন। JMU-র নেতৃত্বে ১৯৫৮ সালে টিসকোর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ধর্মঘট হয়।

গোটা ১৯৫৭ সাল ধরে শ্রমিক বিক্ষোভ, ছোটখাট ধর্মঘট, ধরপাকড় ইত্যাদি চলার পর ১৯৫৮ সালের ১২ মে JMU এক দিনের ধর্মঘট ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিহার সরকার ঐ ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে। এরপর দু-সপ্তাহব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হয় যাতে একদিকে থাকে টাটা কর্তৃপক্ষ, সরকার ও সরকারি ইউনিয়ন TWU, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ২৯,০০০ শ্রমিক। আজ যে সিপিএম নেতারা বলেন যে টাটা কারখানায় কখনো ধর্মঘট হয় না তারা তাদের নিজেদের পার্টির এই ইতিহাস ভুলে গেছেন। ধর্মঘট ভাঙতে পুলিশ গুলি চালায় ও ২০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ২০ মে মিলিটারি নামানো হয়। JMU অফিস পুলিশ দিয়ে ভেঙে দেওয়া, মিটিং নিষিদ্ধ করা, কারফিউ ঘোষণা, অসংখ্য গ্রেফতার ও পেটানো এবং গুলিবর্ষণ এইভাবেই টাটা কর্তৃপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে বিহার সরকার এই ধর্মঘটকে পিষে মারে। এমনও শোনা যায় যে শ্রমিকদের দেহ স্টিল ফার্নেসে ফেলে দেওয়া হয় প্রমাণ লোপ করার জন্যে। ৪০০ শ্রমিককে সরাসরি ছাঁটাই করা হয়। এরপর সরকার জামশেদপুর ষড়যন্ত্র মামলা করে বহু নেতা ও শ্রমিককে বহু বছর ধরে জেলে আটকে রাখে ও অত্যাচার করে। ১৯৫৮ সালের ২৮ মে এই ধর্মঘট ভেঙে যায়। ১৯৫৮ সালের এই ধর্মঘট ও ধর্মঘট ভাঙাকে কেন্দ্র করে টাটার শ্রমিক বিরোধী রূপ একদম স্পষ্ট হয়ে যায়।

টাটার এই শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপ চলতে থেকেছে রতন টাটার অধীনেও। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক উদারীকরণের সময় থেকেই, যখন রতন টাটাও কার্যভার গ্রহণ করেন, মুনাফা বাড়ানোর জন্য টাটার কর্মীসংখ্যা সমানে কমানো হয়েছে। টাটা স্টীলের কর্মী সংখ্যা ১৯৯৪ সালে ছিল ৭৮,০০০ যা ১৯৯৭ সালে কমে হয় ৬৫,০০০ এবং ২০০৬ সালে এসে দাঁড়ায় ৩৮,০০০-এ। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে টাটার কর্মীসংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। একই সময়ে টাটার আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় টাটার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দুই শ্রমিক চাকরি চলে যাওয়ার কষ্টে আত্মহত্যা করে। একইভাবে বোম্বেতে উর্দ্ধগামী জমির দামের সুবিধা নিতে টাটারা তাদের বহুদিনের কাপড় কল স্বদেশী মিলস্ বন্ধ করে দেয় এবং চড়া দামে কারখানার জমিটি বিক্রি করে দেয়। এতে ২৮০০ শ্রমিক কর্মহীন হন এবং অন্তত একজন আত্মহত্যা করেন। ১৯৮৯ সালেও টাটার সংস্থা টেলকোর পুনে কারখানার শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘট রাতের অন্ধকারে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। বিশ্বায়নের যুগে সংস্থাকে আরো 'প্রতিযোগিতামূলক' করতে টাটাদের শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপ লাগাতার চলছে। জামশেদপুরসহ প্রায় সর্বত্রই শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারগুলির প্রাপ্য নানা সুযোগ সুবিধার

ব্যাপক হ্রাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ২০০০ সালেও রতন টাটার পদ্মভূষণ পাওয়ার কদিন বাদেই টেলকোতে ধর্মঘট হয়।

টাটাদের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ

সিঙ্গুরে আজ কৃষিজীবি মানুষেরা টাটা কারখানার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগঠিত করেছেন তা কিন্তু নতুন কিছু নয়। এমনটা নয় যে, যে রাজ্যেই টাটা পদার্পণ করেছে সে রাজ্যের মানুষ তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উন্নয়ন ও শিল্পায়নের পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বহু জায়গায় টাটাকে জনপ্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং অনেক জায়গায়ই তাদেরকে পিছু হঠতে হয়েছে। টাটাদের সব জায়গায় সাদর আমন্ত্রণ জানায় শুধু বণিক গোষ্ঠী এবং তাদের চালিত সংবাদপত্রগুলি এবং সেইসব রাজনৈতিক দল যারা টাটাকে আহ্বান করে নিয়ে আসছে। এবং এদেরই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত মানুষও ভাবেন যে টাটার আগমনের সূত্রে তাদের জীবনের উন্নতি হবে। কিন্তু প্রায় সব স্থানেই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ টাটার স্বরূপকে উপলব্ধি করে তাদের প্রতিরোধ করে।

দু বৎসর আগে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি ও তুতিকোরিন জেলায় জমি অধিগ্রহণ করে টাটারা এক বৃহৎ টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড প্রকল্প শুরু করে। ২৫০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়। বিরোধী এ আই এ ডি এম কে দলনেত্রী জয়ললিতা এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। সেই সময় টাটা স্টিলের এম ডি মুথুরামান বলেছিলেন "কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশসহ বহু রাজ্যই আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তবুও আমরা যাচ্ছি না। আমরা এই রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে চাই। স্থানীয় মানুষের উন্নয়নের জন্যই আমরা এই প্রকল্প করছি। আমাদের সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।" এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি আমরা গত দু বছর বারবার শুনেছি টাটা মোটরস এর এম.ডি রবিকান্ত এবং রতন টাটার মুখে। কিন্তু তামিলনাড়ুর মানুষ এই কথায় ভোলেননি। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে এবং পুলিশের গুলিতে দুজনের মৃত্যুও ঘটে। শেষ অবধি করুণানিধির ডি এম কে সরকার এই প্রকল্প বন্ধ করতে বাধ্য হন।

সম্প্রতি কেরলেও মুন্নার জেলায় টাটাদের হাত থেকে সিলিং বর্হিভূত ৫ হাজার একর জমি ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন 'বাম' মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন। বেশ কয়েক শত একর জমি উদ্ধারের পর দলের একাংশের চাপে এই কাজ ২০০৭ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রবল জন সমর্থনের মধ্যে ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে এই অভিযান আবার শুরু হয়েছে জমির উর্ধ্বসীমার উপর টাটার হাতে থাকা ৯০ একর জমি

উদ্ধারের মধ্যে দিয়ে। এই উদ্ধার হওয়া জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে বলে কেরল সরকার ঘোষণা করেছে।

ওড়িশাতে প্রথম টাটাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। ওড়িশার গোপালপুরে টাটা স্টিল ১০ হাজার মেট্রিক টনের একটি ইস্পাত প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়। ৩২০০ একর জমি ওড়িশা সরকার টাটার হাতে তুলে দেয়। স্থানীয় অধিবাসীদের চরম বিক্ষোভের মুখে পড়ে টাটাকে এই কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। সেই সময়ও পুলিশের গুলিতে সেখানে মানুষজন নিহত হন। বহু বছর ধরে কাজ বন্ধ থাকলেও টাটারা কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফেরত দেয় নি। সম্প্রতি তারা সেখানে 'সেজ' গঠনের পরিকল্পনা করেছে। ওড়িশাতেই চিল্কা হ্রদে চিংড়ি মাছ চাষের প্রকল্প করে টাটারা। ১০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে চিল্কা হ্রদের, যা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সামুদ্রিক হ্রদ, প্রভূত পরিবেশগত ক্ষতি হত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামেন ওখানকার স্থানীয় মৎসজীবীরা এবং পরিবেশবিদরা। এই মৎসজীবীদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যেত ওই চিংড়ি মাছের প্রকল্পের কারণে। সেখানেও পুলিশ বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মেকী মামলা সাজায়। তবে শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্প থেকেও টাটাকে পিছিয়ে আসতে হয়। ওড়িশার রায়গাড়া জেলায়ও টাটার ক্রোমাইট খনির বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ করেন। একইভাবে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে কটক জেলার নারাজে যেখানে টাটারা ১০০০ মেগাওয়াটের একটি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট করতে চায়। এর মধ্যেই গোডিশাহিতে ১৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে।

তবে ওড়িশায় টাটাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সবচেয়ে বিস্ফোরক রূপ নেয় কলিঙ্গনগরে। এখানকার শিল্পতালুকে টাটারা ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রকল্প স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে। এই জমি থেকে উৎখাত হওয়া আদিবাসীরা ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে টাটাদের প্রকল্প ঘিরে ফেলে। ২০০৬ সালের ২রা জানুয়ারি নবীন পটনায়েক সরকারের পুলিশ নিরস্ত্র আদিবাসীদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ১৪ জনকে হত্যা ও ৩৭ জনকে গুরুতর ভাবে আহত করে। তিনজন মহিলা ও একটি শিশুও মৃতদের তালিকায় ছিল। টাটার মুখপাত্র সঞ্জয় চৌধুরি একে 'উন্নয়নের পথে এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা' অভিহিত করে কোন দায় দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এই গণহত্যার প্রতিবাদে কয়েক হাজার আদিবাসী মানুষ তীর ধনুক নিয়ে দইতারি-পারদ্বীপ এক্সপ্রেওয়ে অবরোধ করেন এবং ওই পথে সকল খনিজ চলাচল বন্ধ করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে টাটাদের কলিঙ্গনগর থেকেও পালিয়ে আসতে হয়। আজ আবার নবীন পটনায়েক সরকার টাটাদের ন্যানো কারখানা ওড়িশায় নিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে, কিন্তু টাটারা

জানে যে ওড়িশার মানুষের কাছে তারা একদমই কাঙ্খিত নয়। এছাড়াও কর্ণাটকে ১৯৯০-এর দশকে টাটা সংস্থার তাজ হোটেলস্ নাগরহোলে জাতীয় উদ্যানের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে জঙ্গল লজের নামে বিলাস বহুল একটি রিসর্ট করার পরিকল্পনা নেয়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক থেকে তারা এই বিষয়ে কোন ছাড়পত্র নেওয়ার চেষ্টাই করে নি। শেষ অবধি নাগরহোলের আদিবাসীদের বিক্ষোভের ফলে এবং আদালতে একটি মামলার ফলে, টাটাদের এই জায়গা থেকে সরে যেতে হয়। ছত্তিশগড়ের লোহাণ্ডিগুডায়ও টাটাদের একটি ইস্পাত প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা আন্দোলন করছেন।

শুধু ভারতেই নয়, বিদেশ থেকেও টাটাদের জন প্রতিরোধের মুখে পিছু হঠতে হয়েছে। টাটারা বাংলাদেশে ৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে সার, ইস্পাত ও বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা নেয়। এই প্রকল্পগুলি বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে গড়ে উঠবে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় কারণ সেখানকার মানুষ উপলব্ধি করেন যে এই প্রকল্পগুলির দ্বারা টাটারা সস্তায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস লুঠ করে রপ্তানির জন্য সার, ইস্পাত ইত্যাদি বানাবে এবং বিরাট লাভ করবে। প্রবল প্রতিবাদের সামনে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্প থেকে পিছিয়ে আসে এবং টাটারা হতাশ হয়ে প্রকল্পটি বাতিল করে। এমনকি টাটারা সদ্য অধিগৃহীত ইংল্যান্ডের কোরাস স্টিল কোম্পানিটিতেও শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এর থেকেই বোঝা যায় যে সিঙ্গুরে টাটাদের বিরুদ্ধে কৃষিজীবী মানুষদের প্রতিরোধ কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। বহু জায়গায় মানুষ তাদের জীবন জীবিকা রক্ষা করতে টাটাদের প্রতিরোধ করেছেন। কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে তাদের ন্যানো কারখানা স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করলে সেখানকার মানুষও টাটাদের প্রতিরোধ করতে তৈরি হ'ন। ধারওয়াড়ে পূর্বেই টাটাদের ৩০০ একর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ করেছিল। আর ধারওয়াড়ের মানুষদের টাটাদের বিরুদ্ধে নতুন আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন কর্ণাটক রাজ্য সিপিএম-এর সম্পাদক জিএন নাগরাজ। ভোট রাজনীতির কি বিচিত্র পরিহাস! অন্যদিকে ন্যানো তৈরির জন্য টাটার পন্থনগরের কারখানার সম্ভাব্য সম্প্রসারণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সেখানকার স্থানীয় মানুষ। সেখানকার জনগণও কিষাণ কিষাণী প্রতিরোধ সঙ্ঘ বলে এক সংগঠন সৃষ্টি করেছেন টাটাদের প্রতিরোধ করার জন্য। একই ছবি অন্ধ্রপ্রদেশেও। এখানেও ন্যানো কারখানার জন্য জমি দেখতে গিয়ে কৃষকদের তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন টাটা মোটরস কর্তৃপক্ষ। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন গুজরাটের কৃষকরাও। সিঙ্গুরের জনগণের আন্দোলন আজ

ভারতের দিকে দিকে অনুরনন তুলেছে এবং টাটা যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের প্রতিভূ তার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধকে অনুপ্রাণিত করেছে।

পরিশিষ্ট

টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা ন্যানো প্রকল্পটিকে সিঙ্গুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। এই ঘোষণায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, কিছু বুদ্ধিজীবি এবং পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার যে প্রচার চালাচ্ছে তা হল যে পশ্চিমবঙ্গের 'উন্নয়নের ধারা' রুদ্ধ হয়ে গেল। এই প্রচারে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত। কিন্তু টাটার সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিঙ্গুর নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল তার প্রকাশিত অংশটুকুর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সিঙ্গুর প্রকল্প হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হত। সেই টাকাটা টাটাকে জমি বাবদ, কর ছাড় বাবদ, প্রায় বিনা সুদে ঋণ বাবদ এবং বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদির উপর ভর্তুকি বাবদ দেওয়া হচ্ছিল। এর পরিবর্তে যা পশ্চিমবঙ্গ পেত তা হচ্ছে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ, যে দুটিই ছিল সম্ভাবনার গর্ভে এবং বহু অর্থনীতিবিদের মতে তেমন কিছু হত না। আমাদের চিন্তা করা উচিত যে টাটার মত একটি সংস্থা, যেটি গত এক বছরে ৫৬,০০০ কোটি টাকা দিয়ে বিদেশী কোম্পানী কিনেছে, তার কেন শিল্পায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মত দরিদ্র রাজ্য থেকে ৩০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য, স্কুলে কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য, রাস্তা সারাবার মত সামাজিক ও পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য পয়সা নেই; সেই দরিদ্র রাজ্যকে ব্ল্যাকমেল করে ৩০০০ কোটি টাকা আদায় করতে টাটার কোনো সংকোচ ছিল না। এ কি ধরনের 'সামাজিক দায়বদ্ধতা'?

আর একটা কথা, শুধু টাটা গোষ্ঠী নয় শিল্পায়নের ললিপপ মুখের সামনে ধরে সারা দেশের মত এরাজ্যেরও জমি-জঙ্গল-সম্পদ লুঠ করতে আসছে দেশী-বিদেশী নানা সংস্থা। তাদের স্বরূপও আমাদের জানতে-বুঝতে হবে। গড়তে হবে গণ-প্রতিরোধ। আমাদের বক্তব্য : জনস্বার্থ বিরোধী জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এই শিল্পায়ন আমরা চাই না। তাই আসুন, প্রতিবাদে প্রতিরোধে সোচ্চার হই।

SEZ বিরোধী প্রচার মঞ্চের পক্ষে সভাপতি বিতান মজুমদার কর্তৃক
৫বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত।